# উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

রেভারেণ্ড্ সি. এফ্. এণ্ড্রুজ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

শান্তিনিকেতন

১লা বৈশাখ ১৩২১

১

ভোরের পাখি ডাকে কোথায়
ভোরের পাখি ডাকে,
ভোর না হতে ভোরের খবর
কেমন করে রাখে!
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালি-বরন পুচ্ছ ভোরের
হাজার লক্ষ পাকে।
ঘুমিয়ে-পড়া বনের কোণে
পাখি কোথায় ডাকে!

ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোটো পাখি,
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে
মেল' তোমার আঁখি!
কোমল তোমার পাখার 'পরে
সোনার রেখা স্তরে স্তরে,
বাঁধা আছে ডানায় তোমার
উষার রাঙা রাখী।

ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোটো পাখি !

রয়েছে বট, শতেক জটা
ঝুলছে মাটি ব্যেপে—
পাতার উপর পাতার ঘটা
উঠছে ফুলে ফেঁপে।
তাহারি কোন্ কোণের শাখে
নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে,
পাখাতে মুখ ঝেঁপে,
যেখানে বট দাঁড়িয়ে একা
জটায় মাটি ব্যেপে।

ওগো ভোরের সরল পাখি,
কহো আমায় কহো—
ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
ঘুমিয়ে যখন রহ,
হঠাৎ তোমায় কুলায়-'পরে
কেমন ক'রে প্রবেশ করে
আকাশ হতে আঁধার-পথে
আলোর বার্তাবহ।

ওগো ভোরের সরল পাখি,
কহো আমায় কহো।

কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে,
উড়বে ব'লে পুলক জাগে
তোমার পক্ষপুটে।
চক্ষু মেলি পুবের পানে
নিদ্রা-ভাঙা নবীন গানে
অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
উৎস-সমান ছুটে।
কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে।

এত আঁধার-মাঝে তোমার
এতই অসংশয়!
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাকো, 'দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে—
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।'

এত আঁধার-মাঝে তোমার
এতই অসংশয় !

আনন্দেতে জাগো আজি
আনন্দেতে জাগো।
ভোরের পাখি ডাকে যে ওই,
তন্দ্রা এখন না গো।
প্রথম আলো পড়ুক মাথায়
নিদ্রা-ভাঙা আঁখির পাতায়,
জ্যোতির্ময়ী উদয়দেবীর
আশীর্বচন মাগো।
ভোরের পাখি গাহিছে ওই,
আনন্দেতে জাগো।

হাজারিবাগ
১১ চৈত্র ১৩০৯

২

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া
বাহির হনু তিমিররাতে
তরণীখানি বাহিয়া।
অরুণ আজি উঠেছে,
অশোক আজি ফুটেছে—

না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে
তোমার মুখে চাহিয়া।

নয়নপাতে ডেকেছ মোরে
নীরবে।
হৃদয় মোর নিমেষ-মাঝে
উঠেছে ভরি গরবে।
শঙ্খ তব বাজিল,
সোনার তরী সাজিল—
না যদি বাজে, না যদি সাজে,
গরব যদি টুটে গো লাজে,
চলিব তবু নীরবে।

কথাটি আমি শুধাব নাকো
তোমারে।
দাঁড়াব নাকো ক্ষণেকতরে
দ্বিধার ভরে দুয়ারে।
বাতাসে পাল ফুলিছে,
পতাকা আজি দুলিছে—
না যদি ফুলে, না যদি দুলে,
তরণী যদি না লাগে কূলে,
শুধাব নাকো তোমারে।

৩

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশচকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী!
তুমি এসো এসো গভীর গোপনে,
এসো গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি,
এসো গো গোপনে।
মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব আছে স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি,
পথ ভরিয়াছে আলোকে
প্রখর আলোকে।
সবার অজানা হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী।
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে—

চিনিব বিরলে নেহারি
পরম পুলকে।
এসো প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
এসো না পথের আলোকে
প্রখর আলোকে।

৪

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল—
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি বুঝি গো তব
ছলনা—
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বল না।

তোমারে পাছে সহজে ধরি
কিছুরই তব কিনারা নাই—
দশের দলে টানি গো পাছে
বিরূপ তুমি বিমুখ তাই।

বুঝি গো আমি বুঝি গো তব
ছলনা—
যে পথে তুমি চলিতে চাও
সে পথে তুমি চল না।

সবার চেয়ে অধিক চাহ,
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও।
হেলার ভরে খেলার মতো
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও?
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব
ছলনা—
সবার যাহে তৃপ্তি হল
তোমার তাহে হল না।

৫

আপনারে তুমি করিবে গোপন
কী করি?
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।
আজ আসিয়াছ কৌতুকবেশে,
মানিকের হার পরি এলোকেশে—

নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়পুলিনে।
ভুলি নে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,
ভুলি নে চতুর নিঠুর বাক্যে
ভুলি নে।
করপল্লবে দিলে যে আঘাত
করিব কি তাহে আঁখিজলপাত—
এমন অবোধ নহি গো।
হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো।

আজ এই বেশে এসেছ আমায়
ভুলাতে।
কভু কি আস নি দীপ্ত ললাটে
স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে?
দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা,
জলে ছলছল ম্লান আঁখিতারা,
দেখেছি তোমার ভয়ভরে সারা
করুণ পেলব মুরতি।
দেখেছি তোমার বেদনাবিধুর
পলকবিহীন নয়নে মধুর
মিনতি।

আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহি গো।
হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো।

৬

তোমায় চিনি ব'লে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে ;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জন এসে মোরে ডেকে কয়
'কে গো সে', শুধায় তব পরিচয়
'কে গো সে'—
তখন কী কই নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি 'কী জানি কী জানি'।
তুমি শুনে হাস, তারা দুষে মোরে
কী দোষে !

তোমায় অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।

গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে
পারি নি আপন প্রাণে।
কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে,
'যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
কিছু কি ?'
তখন কী কই নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি 'অর্থ কী জানি'।
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে
মুচুকি।

তোমায় জানি না, চিনি না, এ কথা বলো তো
কেমনে বলি !
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও ছলি।
জ্যোৎস্নানিশীথে, পূর্ণশশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে—
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে।

তোমায়  খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে।
চিরকাল-তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশিতে ভরেছি কোমল নিখাদ—
তবু সংশয় জাগে ধরা তুমি
দিলে কি!
কাজ নাই— তুমি যা খুশি তা করো,
ধরা নাই দাও মোর মন হরো,
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি।

৭

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না—
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না!

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশি মম
উতলা-পাগল-সম।
যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

৮

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে-

ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার

পরশ পাবার প্রয়াসী।

আমি সুদূরের পিয়াসি।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে

বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—

মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,

সে কথা যে যাই পাশরি।

আমি উৎসুক হে,

হে সুদূর, আমি প্রবাসী।

তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো

কী কথা আমায় শুনাও সতত,

তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়

জেনেছে তাহার স্বভাষী।

হে সুদূর, আমি প্রবাসী।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে

বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—

নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ,

সে কথা যে যাই পাশরি।

আমি উন্মনা হে,

হে সুদূর, আমি উদাসী।

রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি!
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার,
সে কথা যে যাই পাশরি।

[ মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৯ ]

## ৯

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে,
কাঁদিছে আপন-মনে
কুসুমের দলে বদ্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে।
কহিছে সে, 'হায় হায়,
বেলা যায়, বেলা যায় গো,
ফাগুনের বেলা যায়।'

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।

কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
পুরিবে সকল কামনা।
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে,
ফিরিছে আপন-মাঝে—
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কী জানি কিসের কাজে!
কহিছে সে, 'হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়।'

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
দখিনপবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছে রে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর দিন তোর চলে যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে,
ভাবিছে উদাস-পারা—
'জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থহারা!'

কহিছে সে, 'হায় হায়,
কেন আমি বাঁচি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়।'

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি— জনম ব্যর্থ যাবে না।

[ আশ্বিন ১৩০৯ ]

১০

আমার মাঝারে যে আছে কে গো সে,
কোন্ বিরহিণী নারী!
আপন করিতে চাহিনু তাহারে,
কিছুতেই নাহি পারি।
রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন্ খানে!
সেবা করিলাম দিবানিশি তার,
গাঁথি দিনু গলে কত ফুলহার—
মনে হল, সুখে প্রসন্নমুখে
চাহিল সে মোর পানে।

কিছু দিন যায়, একদিন হায়
ফেলিল নয়নবারি—
'তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই'
কহে বিরহিণী নারী।

রতনে জড়িত নূপুর তাহারে
পরায়ে দিলাম পায়ে,
রজনী জাগিয়া ব্যজন করিনু
চন্দন-ভিজা বায়ে।
রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন্ খানে!
কনকখচিত পালঙ্ক-'পরে
বসানু তাহারে বহু সমাদরে,
মনে হল হেন হাসিমুখে যেন
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায়, লুটায়ে ধুলায়
ফেলিল নয়নবারি—
'এ সবে আমার কোনো সুখ নাই'
কহে বিরহিণী নারী।

বাহিরে আনিনু তাহারে, করিতে
হৃদয়দিগ্বিজয়।

সারথি হইয়া রথখানি তার
চালান্থ ধরণীময়।
রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন্ খানে!
দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ,
দিকে দিকে তার উঠে চাটুগান—
মনে হল তবে, দীপ্ত গরবে
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায়, মুখ সে ফিরায়,
ফেলে সে নয়নবারি—
'হৃদয় জুড়ায়ে কোনো সুখ নাই'
কহে বিরহিণী নারী।

আমি কহিলাম, 'কারে তুমি চাও,
ওগো বিরহিণী নারী?'
সে কহিল, 'আমি যারে চাই তার
নাম না কহিতে পারি।'
রমণীরে কেবা জানে—
মন তার কোন্ খানে!
সে কহিল, 'আমি যারে চাই তারে
পলকে যদি গো পাই দেখিবারে
পুলকে তখনি লব তারে চিনি
চাহি তার মুখপানে।'

দিন চলে যায়, সে কেবল হায়
ফেলে নয়নের বারি—
'অজানারে কবে আপন করিব'
কহে বিরহিণী নারী।

১১

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ,
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
পেয়েছি তাই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ—
কারেও আমি দেখাব নাকো সেটি।
লিখন আমি নাহিকো জানি,
বুঝি না কী যে রয়েছে বাণী—
যা আছে থাক্ আমার থাক্ তাহা।
পেয়েছি এই সুখে আজি
পবনে উঠে বাঁশরি বাজি,
পেয়েছি সুখে পরান গাহে 'আহা'।

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামত।

যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন লয়ে পুরানো পুঁথি যত।
শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে,
ধন্দ লয়ে পড়িব মহাগোলে।
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি,
যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে।

রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে চারি ধারে,
গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা,
ধরিব লিপি প্রসারিয়া
বসিয়া গৃহদ্বারে,
পুলকে রব হয়ে পলকহারা।
তখন নদী চলিবে বাহি
যা আছে লেখা তাহাই গাহি,
লিপির গান গাবে বনের পাতা—
আকাশ হতে সপ্তঋষি
গাহিবে ভেদি গহন নিশি
গভীর তানে গোপন এই গাথা।

বুঝি না-বুঝি ক্ষতি কিবা,

রব' অবোধসম—

পেয়েছি যাহা কে লবে তাহা কাড়ি !

রয়েছে যাহা নিশিদিবা

রহিবে তাহা মম,

বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি।

খুঁজিতে গিয়া বৃথাই খুঁজি,

বুঝিতে গিয়া ভুল যে বুঝি,

ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর।

না-বোঝা মোর লিখনখানি

প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি,

সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।

হাজারিবাগ

১ চৈত্র ১৩০৯

১২

'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা !

ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে, করিতে পারি নে সেবা।'

শিশির কহিল কাঁদিয়া,

'তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া,

হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল।

তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন

কেবলি অশ্রুজল।'

'আমি   বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।'
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
'ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।'

১৩

আজ মনে হয়, সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে
শুধু তুমি আমি এসেছি।
দেখি চারি দিক -পানে
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে!
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে।
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি!

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী—
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া—

পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথ নি কি মোর জীবনে ?
সে প্রভাতে কোন্ খানে
জেগেছিনু কেবা জানে !
কী মুরতি-মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে !
হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া—
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

১৪

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।

পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুলসুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলনবিহীন
মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারি ভিতে
পারি নি তাদের আপন করিতে,
তারা নিশিদিশি জাগাইছে চিতে
বিরহবেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে।

তৃণে-পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা কেমনে!

মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে!
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম-যেন জানে সে।
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কী আর মনে তাহা আনি—
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে!
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে।

এ সাত-মহলা ভবনে আমার
চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে,
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে!
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চিরজনমের ভিটাতে!

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা—
ছোটো বড়ো হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা।
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা—
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

বিশাল বিশ্বে চারি দিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শতকোটি কর হানিছে।

ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস ?
মোর তরে জল দু হাত বাড়াস ?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
    চির-আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
    সবাই আমারে টানিছে।

আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়,
    আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে ছোটো কণাটিরে
    তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চিরগৌরব
    এ কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
    প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

ধুলা-সাথে আমি ধুলা হয়ে রব
    সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
    তাঁর পূজারতিবরণে।

যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে।
যাহা হই আমি তাই হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।

ধন্য রে আমি অনন্তকাল,
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণবরনী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবনতরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি,
ধন্য এ মোর ধরণী।

৩ ফাল্গুন ১৩০৭

১৫

আকাশসিন্ধু-মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে,
জগৎ-ঘূর্ণি জেগেছে।

ঝলকি উঠেছে রবিশশাঙ্ক,
ঝলকি ছুটেছে তারা,
অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে
অবিরাম মাতোয়ারা।
স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্য-পানে।
সুন্দরী, ওগো সুন্দরী,
শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি।
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে,
অচল তোমার রূপরাশি।
নানা দিক হতে নানা দিন দেখি—
পাই দেখিবারে ওই হাসি।

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পূরণে,
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরনে।
কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে
চলে যায় সেই দূরে,
হাতে পাই যারে পলক ফেলিতে
তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে।

কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারি নে কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু।
হে প্রেম, হে ধ্রুবসুন্দর,
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর।
দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত,
ঝরে নির্ঝর কলভাষে—
অসীমের চির-চরমশান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে।

১৬

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব-আশিস্-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ—

জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ-'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
হিরণ-কিরণে-গাঁথা—
তখন ভারতে শুনি চারি ভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গীতে
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রীগাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে,
শুনিনু আজিকে নিমেষে
অতীত হইতে উঠিছে হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে।

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না,
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণহুংকার
ভেদি বণিকের ধনঝংকার
মহাকাশতলে উঠে ওঙ্কার
কোনো বাধা নাহি মানি।
ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সংগীততানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব মহাবাণী।
নয়ন মুদিয়া ভাবীকাল-পানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে—
তব মঙ্গলবিজয়শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

[ পৌষ ১৩০২ ]

১৭

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।

সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

১৮

তোমার বীণায় কত তার আছে
কত-না সুরে,
আমি তার সাথে আমার তারটি
দিব গো জুড়ে।
তার পর হতে প্রভাতে সাঁঝে
তব বিচিত্র রাগিণী-মাঝে
আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া
বাজিবে তবে—
তোমার সুরেতে আমার পরান
জড়ায়ে রবে।

তোমার তারায় মোর আশাদীপ
রাখিব জ্বালি।
তোমার কুসুমে আমার বাসনা
দিব গো ঢালি।
তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে,
দুলিবে সুখে—
মোর পরানের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে।

১৯

হে রাজন্‌, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহদুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই,
মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই—
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যায়,
কোথা হতে যায় কোথা রে!

কেহ নাহি চায় থামিতে।
শিরে লয়ে বোঝা চলে যায় সোজা,
না চাহে দখিনে বামেতে।

বকুলের শাখে পাখি গায়,
ফুল ফুটে তব আঙিনায়—
না দেখিতে পায়, না শুনিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে !

বাঁশি লই আমি তুলিয়া
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া
আছে যাহা চিরপুরাতন
তারে পায় যেন হারাধন—
বলে, 'ফুল এ কী ফুটিয়াছে দেখি !
পাখি গায় প্রাণ খুলিয়া !'

হে রাজন্, তুমি আমারে
রেখো চিরদিন বিরামবিহীন
তোমার সিংহদুয়ারে।
যারা কিছু নাহি কহে যায়,
সুখদুখভার বহে যায়,
তারা ক্ষণতরে বিস্ময়ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে
তোমার সিংহদুয়ারে।

[ কার্তিক ১৩০২ ]

২০

দুয়ারে তোমার ভিড় ক'রে যারা আছে,
ভিক্ষা তাদের চুকাইয়া দাও আগে।
মোর নিবেদন নিভৃতে তোমার কাছে—
সেবক তোমার অধিক কিছু না মাগে।
ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র,
শুধু বীণাখানি রেখেছি মাত্র,
বসি এক ধারে পথের কিনারে
বাজাই সে বীণা দিবসরাত্র।

দেখো, কতজন মাগিছে রতনধূলি,
কেহ আসিয়াছে যাচিতে নামের ঘটা,
ভরি নিতে চাহে কেহ বিদ্যার ঝুলি,
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা।
আমি আনিয়াছি এ বীণাযন্ত্র,
তব কাছে লব গানের মন্ত্র—
তুমি নিজ হাতে বাঁধো এ বীণায়
তোমার একটি স্বর্ণতন্ত্র।

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে।
পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা—
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।

তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ
ঝংকার দিব কত-কী ছন্দ,
যত গান গাব তব বাঁধা তারে
বাজিবে তোমার উদার মন্ত্র।

২১

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে—
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘগর্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে রাজে,
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া—
আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
গরজি ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে মাতিয়া।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্তে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে—
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে।

নব-অরণ্যে মর্মরতান তুলি
যৌবনবনে উড়াই কুসুমধূলি,
চিত্তগুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ কিরণে ঢাকি
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

নাহি জানি আমি কী পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি—
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে।

যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি।
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি—
সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে!
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

[ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ ]

২২

আছি আমি বিন্দুরূপে হে অন্তরবাসী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। 'আছি আমি'
এ কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে। 'আছি' আর 'আছে'
অন্তহীন আদিপ্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর! তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।' করে তারা একাকার
অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব— আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।

[ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ ]

২৩

শূন্য ছিল মন,
নানা কোলাহলে ঢাকা
নানা-আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা জনতায় ফাঁকা
কর্মে অচেতন
শূন্য ছিল মন।

জানি না কখন এল নূপুরবিহীন
নিঃশব্দ গোধূলি।
দেখি নাই স্বর্ণরেখা
কী লিখিল শেষ লেখা
দিনান্তের তূলি।
আমি যে ছিলাম একা
তাও ছিনু ভুলি।
আইল গোধূলি।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো
কোন্ স্বর্গ হতে

চাঁদখানি লয়ে হেসে
শুক্লসন্ধ্যা এল ভেসে
আঁধারের স্রোতে!
বুঝি সে আপনি মেশে
আপন আলোতে।
এল কোথা হতে!

অকস্মাৎ-বিকশিত পুষ্পের পুলকে
তুলিলাম আঁখি।
আর কেহ কোথা নাই,
সে শুধু আমারি ঠাঁই
এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়ালো তাই
মোর মুখে রাখি
অনিমেষ আঁখি।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জবিতানে—
কার কথা হেনকালে
কহি গেল কানে
শুনেছি পুরাণে।

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মতো আকাশ বাহিয়া
এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে!
সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলনকৌতুকে
এল মোর বুকে!

দুইখানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে
সর্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির
নিস্পন্দ রহিল স্থির
কথাটি না কয়ে।
কোন্ পদ্মবনানীর
কোমলতা লয়ে
পশিল হৃদয়ে!

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।

এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
রব আমি একা।

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিনরজনী
এ মোর জীবন।
হায় হায়, চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর,
চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে
কী দিব উত্তর!
অশ্রু আসে দু নয়ানে,
নির্বাক্ অন্তর
হে সৌম্য-সুন্দর!

আশ্বিন ১৩০২]

## ২৪

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিমনীড়-পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে!
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর— সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণীধারা।
হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ।
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌনশান্তহিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।

আলমোড়া
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

## ২৫

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজি
তোমার সর্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্যাম শষ্পরাজি
প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে; বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার

বল্কলে শৈবালে জটে ; সুদুর্গম তোমার শিখর
নির্ভয় বিহঙ্গ যত কলোল্লাসে করিছে মুখর।
আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশঙ্ক কুটিরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্ধিতে আকাশ—
কম্পমান ভূমণ্ডলে— চন্দ্রসূর্য করিবারে গ্রাস,
সেদিন হে গিরি তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয়।
যখনি থেমেছ তুমি, বলিয়াছ 'আর নয় নয়',
চারি দিক হতে এল তোমা-'পরে আনন্দনিশ্বাস,
তোমার সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১ আষাঢ় ১৩১০

## ২৬

আজি হেরিতেছি আমি হে হিমাদ্রি গভীর নির্জনে,
পাঠকের মতো তুমি বসে আছ অচল আসনে ;
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অঙ্ক-'পরে।
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে ;
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
গেল এল কত যুগ— পড়া তব হইল না শেষ।
আলোকের দৃষ্টিপথে এই-যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা—
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর

বাহুর করুণ আকর্ষণে, কিছু নাহি চাহি যাঁর
তিনি কেন চাহিলেন, ভালোবাসিলেন নির্বিকার,
পরিলেন পরিণয়পাশ! এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা।

আলমোড়া
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

২৭

তুমি আছ হিমাচল, ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মতো। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ় ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।
তোমার সহস্র শৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী, 'শুন শুন বিশ্বজন সবে,
জেনেছি, জেনেছি আমি।' যে ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হতে
আদি-অন্ত-বিহীনের অখণ্ড অমৃতলোক-পানে
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে।
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকূতি—
সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৮ আষাঢ় [ ১৩১০ ]

২৮

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারম্বার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মুরতি।
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি—
দুর্গম দুঃসহ মৌন, জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্তরবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান্ দরিদ্র রিক্ত আভরণহীন দিগম্বর,
হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কী লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

শান্তিনিকেতন
৩ আষাঢ় ১৩১০

২৯

ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিঃশ্বসে গগনে
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণসমীরণে,
অনির্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ।
ঊর্ধ্ববাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্‌বাহিত মেঘ

শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
রাখিছ নিরুদ্ধ করি— পুনর্বার উন্মুক্ত ধারায়
নূতন আনন্দস্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
অসীমজিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে।
সেইমতো ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ ঊর্ধ্ব-পানে যে বাণী বিশাল—
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—
রেখেছ সঞ্চয় করি, হে হিমাদ্রি, তুমি স্তব্ধশিরে।
তব মৌন শৃঙ্গ-মাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত-শিব-অদ্বৈতের সনে।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৯ আষাঢ় ১৩১০

৩০

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ! কী অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণনগরীর শুষ্ক ধূলিতলে!
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্তে বিশ্বের কেন্দ্র-মাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি, এক যেথা একাকী বিরাজে

সূর্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষী-ধূলায় প্রস্তরে,
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক-'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সংগীতে। মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে—
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পরভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে! আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে! সংযত গম্ভীর করি মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক-লোকান্তের অন্তরালে, যেথা পূর্বঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে।
হে তপস্বী, ডাকো তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে
'উত্তিষ্ঠত নিবোধত'। ডাকো শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাকো মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে,
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোমহুতাগ্নি ঘিরিয়া।
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে— বসুক সে অপ্রমত্তচিত্তে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।

[ আষাঢ় ১৩০৮ ]

৩১

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি।
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে, ওগো,
আমরা খাঁচার পাখি—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়রাত্রি ঘোর?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে কোথা কিছু নাহি বাকি?—
তোমা-পানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই আমরা খাঁচার পাখি।

ফাল্গুন এলে সহসা দখিনপবন হতে
মাঝে মাঝে রহি রহি
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হতে
অপূর্ব আশা বহি।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর—
কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
ঘনমসী-আঁকা লোহার শলাকা সোনার সুধায় মাখি!
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে আমরা খাঁচার পাখি।

আজি দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা—
আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়ে নি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে—
কার সন্ধান করি অন্তরে বাহিরে!
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন, আপনারে দিব ফাঁকি,
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি আমরা খাঁচার পাখি।

ওগো, আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা।
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদো না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া—
'নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি' কহো আমাদের ডাকি
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান আমরা খাঁচার পাখি।

[ অগ্রহায়ণ ১৩০২ ]

৩২

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী,
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি
আপন চরণপ্রান্তে ; তুমি মুগ্ধ চিতে
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সংগীতে।
স্তবে তব নাহি কান— তাই স্তব করি,
তাই আমি ভক্ত তব অনিন্দ্যসুন্দরী !
ভুবন তোমারে পূজে জেনেও জান না ;
ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে। রাজমহিমারে
যে করপরশে তব পার করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত সে সুন্দর করে
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে।
সেই তো মহিমা তব, সেই তো গরিমা—
সকল মাধুর্য চেয়ে তারি মধুরিমা।

[ ? পৌষ ১৩০৭ ]

৩৩

দেখো চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
আর কোরো না দেরি

ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘন বরন,
দাঁড়াও, তোমায় হেরি।
দাঁড়াও গো ওই আকাশকোলে,
দাঁড়াও আমার হৃদয়দোলে,
দাঁড়াও গো ওই শ্যামল তৃণ-'পরে।
আকুল চোখের বারি বেয়ে
দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে
জন্মে জন্মে যুগে যুগান্তরে।
অমনি করে ঘনিয়ে তুমি এসো,
অমনি করে তড়িৎ-হাসি হেসো,
অমনি করে উড়িয়ে দিয়ো কেশ।
অমনি করে নিবিড় ধারাজলে
অমনি করে ঘন তিমিরতলে
আমায় তুমি করো নিরুদ্দেশ।

ওগো, তোমার দরশ লাগি—
ওগো, তোমার পরশ মাগি
গুমরে মোর হিয়া।
রহি রহি পরান ব্যেপে
আগুনরেখা কেঁপে কেঁপে
যায় যে ঝলকিয়া।
আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে
বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে

জানি নে কোন্‌ দূর সমুদ্রপারে।
সজল বায়ু উদাস ছুটে,
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
পথবিহীন গহন অন্ধকারে!
ওগো, তোমার আনো খেয়ার তরী,
তোমার সাথে যাব অকূল-'পরি,
যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা।
ঝড়ের বেলা তোমার স্মিতহাসি
লাগবে আমার সর্বদেহে আসি,
তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা।

ওই যেখানে ঈশানকোণে
তড়িৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে
বিজন উপকূলে—
তটের পায়ে মাথা কুটে
তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
গিরির পদমূলে,
ওই যেখানে মেঘের বেণী
জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী,
মর্মরিছে নারিকেলের শাখা,
গরুড়সম ওই যেখানে
ঊর্ধ্বশিরে গগন-পানে
শৈলমালা তুলেছে নীল পাখা—

কেন আজি আনে আমার মনে
ওইখানেতে মিলে তোমার সনে
বেঁধেছিলেম বহুকালের ঘর—
হোথায় ঝড়ের নৃত্য মাঝে
ঢেউয়ের সুরে আজো বাজে
যুগান্তরের মিলনগীতিস্বর !

কে গো চিরজনম ভরে
নিয়েছ মোর হৃদয় হ'রে
উঠছে মনে জেগে।
নিত্যকালের চেনাশোনা
করছে আজি আনাগোনা
নবীন ঘন মেঘে।
কত প্রিয়মুখের ছায়া
কোন্ দেহে আজ নিল কায়া,
ছড়িয়ে দিল সুখদুখের রাশি,
আজকে যেন দিশে দিশে
ঝড়ের সাথে যাচ্ছে মিশে
কত জন্মের ভালোবাসাবাসি।
তোমায় আমায় যত দিনের মেলা
লোকলোকান্তে যত কালের খেলা
এক মুহূর্তে আজ করো সার্থক।

এই নিমেষে কেবল তুমি একা
জগৎ জুড়ে দাও আমারে দেখা,
জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক।

পাগল হয়ে বাতাস এল,
ছিন্ন মেঘে এলোমেলো
হচ্ছে বরিষন।
জানি না দিগ্‌দিগন্তরে
আকাশ ছেয়ে কিসের তরে
চলছে আয়োজন।
পথিক গেছে ঘরে ফিরে,
পাখিরা সব গেছে নীড়ে,
তরণী সব বাঁধা ঘাটের কোলে।
আজি পথের দুই কিনারে
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ দ্বারে,
দিবস আজি নয়ন নাহি খোলে।
শান্ত হ রে, শান্ত হ রে প্রাণ,
ক্ষান্ত করিস প্রগল্‌ভ এই গান,
ক্ষান্ত করিস বুকের দোলাদুলি।
হঠাৎ যদি দুয়ার খুলে যায়,
হঠাৎ যদি হরষ লাগে গায়,
তখন চেয়ে দেখিস আঁখি তুলি।

আলমোড়া
৩০ বৈশাখ ১৩১০

৩৪

আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে
বাঁকা পথের ডাহিন পাশে, ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
কে জানে এই গ্রাম,
কে জানে এর নাম,
খেতের ধারে, মাঠের পারে, বনের ঘন ছায়ে!
শুধু আমার হৃদয় জানে, সে ছিল এই গাঁয়ে।

বেণুশাখার আড়াল দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
কত সাঁঝের চাঁদ-ওঠা সে দেখেছে এইখানে!
কত আষাঢ় মাসে
ভিজে মাটির বাসে
বাদ্‌লা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে!
সে-সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে।

এই দিঘি, ওই আমের বাগান, ওই-যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাক-নামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতার-কাটা বারি,
ঘাটের পথরেখা তারি চরণ-লেখাময়।
এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয়!

এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি
এরা সবাই দেখেছিল তারি মুখের হাসি।
কুশল পুছি তারে
দাঁড়াত তার দ্বারে
লাঙল কাঁধে চলছে মাঠে ওই-যে প্রাচীন চাষি।
সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালোবাসি।

পালের তরী কত যে যায় বহি দখিনবায়ে,
দূরপ্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে,
পারের যাত্রীদলে
খেয়ার ঘাটে চলে—
কেউ গো চেয়ে দেখে না ওই ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে।

আলমোড়া
২১ বৈশাখ ১৩১০

৩৫

ওরে আমার কর্মহারা ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া
ওরে আমার মন রে আমার মন,
জানি নে তুই কিসের লাগি কোন্ জগতে আছিস জাগি,
কোন্ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন!

কোন্ পুরানো যুগের বাণী অর্থ যাহার নাহি জানি
তোমার মুখে উঠছে আজি ফুটে।
অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি কোন্ ভাষাতে গাঁথছে গীতি,
শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে।
আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্ছে তোমার পাখা উড়ে,
তোমার সাথে চলতে আমি নারি।
তুমি যাদের চিনি ব'লে টানছ বুকে, নিচ্ছ কোলে,
আমি তাদের চিনতে নাহি পারি।

আজকে নবীন চৈত্রমাসে পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে-সব ব্যথা
এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।
গভীর চিত্তে গোপন শালা সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
জানি নে সে কোন্ জনমের পাওয়া।
দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া।
ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠি -রূপে
ভাঙালো তার চিরযুগের ঘুম।
দেখছে লয়ে মুকুর করে আঁকা তাহার ললাট-'পরে
কোন্ জনমের চন্দনকুঙ্কুম।

আজকে হৃদয় যাহা কহে    মিথ্যা নহে সত্য নহে
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ।
খুলে গেছে কেমন করে    আজি অসম্ভবের ঘরে
মর্চে-পড়া পুরোনো কুলুপ।
সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে    নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
ফেনিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ।
মর্মরিত-তমাল-ছায়ে    ভিজে চিকুর শুকায় বায়ে,
তাদের চেনে, চেনে না বা কেউ।
শৈলতলে চরায় ধেনু,    রাখালশিশু বাজায় বেণু,
চূড়ায় তারা সোনার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়ে লিখা    চৈত্রমাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্বধন-তরে।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে    দখিন বায়ে মধুর তাপে,
তেমনি মম কাঁপছে সারা প্রাণ।
কাঁপছে দেহে কাঁপছে মনে    হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মর্মরিয়া উঠছে কলতান।
কোন্ অতিথি এসেছে গো,    কারেও আমি চিনি নে গো
মোর দ্বারে কে করছে আনাগোনা।
ছায়ায় আজি তরুর মূলে    ঘাসের 'পরে নদীর কূলে
ওগো, তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুম-পাড়ানি    মৌমাছিদের মন-হারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,

জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান।

শুনাস নে গো ক্লান্ত বুকের বেদনা যত সুখের দুখের
প্রেমের কথা আশার নিরাশার।
শুনাও শুধু মৃদুমন্দ অর্থবিহীন কথার ছন্দ,
শুধু সুরের আকুল ঝংকার।
ধারাযন্ত্রে সিনান করি যত্নে তুমি এসো পরি
চাঁপাবরন লঘু বসনখানি।
ভালে আঁকো ফুলের রেখা চন্দনেরই পত্রলেখা,
কোলের 'পরে সেতার লহো টানি।
দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীল-ছায়া গাছের সারে
নয়ন দুটি মগ্ন করি চাও।
ভিন্নদেশী কবির গাঁথা অজানা কোন্ ভাষার গাথা
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গাও।

হাজারিবাগ
১২ চৈত্র ১৩০২

৩৬

আমার খোলা জানালাতে
শব্দবিহীন চরণপাতে
কে এলে গো, কে গো তুমি এলে!
একলা আমি বসে আছি
অস্তলোকের কাছাকাছি
পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে।
অতি সুদূর দীর্ঘপথে
আকুল তব আঁচল হতে
আঁধার-তলে গন্ধরেখা রাখি
জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
কখন্ এলে দুয়ারদেশে
শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি!

তোমার সাথে আমার পাশে
কত গ্রামের নিদ্রা আসে,
পান্থবিহীন পথের বিজনতা,
ধূসর আলো কত মাঠের,
বধূশূন্য কত ঘাটের
আঁধার কোণে জলের কলকথা।
শৈলতটের পায়ের 'পরে
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে,
স্বপ্ন তারি আনলে বহন করি।

কত বনের শাখে শাখে
পাখির যে গান সুপ্ত থাকে
এনেছ তাই মৌননূপুর ভরি।

মোর ভালে ওই কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য-অস্ত,
এনে দেয় গো কাজের অবসান—
সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ
সকল-সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।
আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে
দেহ যেন মিলায় শূন্য-'পরি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি।

যেমনি তব দখিন পাণি
তুলে নিল প্রদীপখানি,
রেখে দিল আমার গৃহকোণে,
গৃহ আমার এক নিমেষে
ব্যাপ্ত হল তারার দেশে
তিমির-তটে আলোর উপবনে

আজি আমার ঘরের পাশে
গগন-পারের কারা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি !
আজি আমার দ্বারের কাছে
অনাদি রাত স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি।

এই মুহূর্তে আধেক ধরা
লয়ে তাহার আঁধার-ভরা
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি,
আমার বাতায়নে এসে
দাঁড়ালো আজ দিনের শেষে—
শোনায় তোমায় গুঞ্জরিত গীতি।
চক্ষে তব পলক নাহি,
ধ্রুবতারার দিকে চাহি
তাকিয়ে আছ নিরুদ্দেশের পানে।
নীরব দুটি চরণ ফেলে
আঁধার হতে কে গো এলে
আমার ঘরে আমার গীতে গানে।

কত মাঠের শূন্যপথে
কত পুরীর প্রান্ত হতে
কত সিন্ধুবালুর তীরে তীরে

কত শান্ত নদীর পারে
কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে
কত সুপ্ত গৃহদুয়ার ফিরে—
কত বনের বায়ুর 'পরে
এলোচুলের আঘাত ক'রে
আনিলে আজ হঠাৎ অকারণে।
বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সুরের
আনিলে গান আমার বাতায়নে।

হাজারিবাগ
১৩ চৈত্র ১৩০৯

৩৭

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়,
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
ভাবে মনে, বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাহি রে।
কেন আসি, কেন হাসি,
কেন আঁখিজলে ভাসি,
কার কথা বলে যাই,
কার গান গাহি রে!
অর্থ কিছুই তার নাহি রে।

ওরে মন, আয় তুই সাজ ফেলে আয়—
মিছে কি করিস নাটবেদীতে ?
বুঝিতে চাহিস যদি বাহিরেতে আয়—
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।
ওই দেখ্ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই
চাস যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস নাটবেদীতে।

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসিরোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।
একের সহিত একে
মিলাইয়া নিবি দেখে,
বুঝে নিবি— বিধাতার
সাথে নাহি যুঝিবি—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

৩৮

চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল !
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল !
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সমুখে যেমন পিছেও তেমন,
মিছে করি মোরা গোল।
চিরকাল একই লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কেবা জানে !

কোথা বসে আছ একেলা!
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা।
খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে—
মোরা কেঁদে ভাবি, আমারি কী ধন
কে লইল বুঝি হরে।
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে কথাটি কেবা জানে!
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।

এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।
আছে তো যেমন যা ছিল—
হারায় নি কিছু, ফুরায় নি কিছু
যে মরিল যেবা বাঁচিল।
বহি সব সুখ দুখ
এ ভুবন হাসিমুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।

আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

পৌষ ১৩০৯ ]

৩৯

সেদিন কি তুমি এসেছিলে ওগো,
সে কি তুমি, মোর সভাতে!
হাতে ছিল তব বাঁশি,
অধরে অবাক হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদবিহ্বল শোভাতে।
সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে
সেদিন নবীন প্রভাতে—
নবযৌবনসভাতে?

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
সব কাজ তুমি ভুলালে।
খেলিলে সে কোন্ খেলা,
কোথা কেটে গেল বেলা!
ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার

রক্তকমল দুলালে।
পুলকিত মোর পরানে তোমার
বিলোল নয়ন বুলালে—
সব কাজ মোর ভুলালে।

তার পরে হায় জানি নে কখন
ঘুম এল মোর নয়নে।
উঠিনু যখন জেগে
ঢেকেছে গগন মেঘে—
তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া
দলিতপত্রশয়নে।
তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে
কাননে কুসুমচয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে।

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝরঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর,
রুদ্ধ করেছি দ্বার—
একা আছে প্রাণ ভূতলশয়ান
আজিকার ভরা ভাদরে।
তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে—

তোমারে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে !

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপসমুরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনল-পারা,
সিক্ত তোমার জটাজূট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপসমুরতি ধরিয়া।

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,
এসো মোর ভাঙা আলয়ে
ললাটে তিলকরেখা
যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে।
এসো এসো ভাঙা আলয়ে।

৪০

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখীর রাঙা সুতো
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে—
আজ কি আছে সেটি সাথে!
বিদায়বেলা এল মেঘের মতো ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দু হাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষুদুটি ছেপে
ভরে যে এল জলধারা।
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে।
ভ্রমর যেন পথহারা—
সেই-যে বাম হাতে একটি সরু রাখী—
আধেক রাঙা, সোনা আঁকা,
আজো কি আছে সেটি বাঁধা!

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে
চৈত্র-ফসলের দেশে।

যখন গেলে চলে  তোমার গ্রীবামূলে
দীর্ঘ বেণী তব  এলিয়ে ছিল খুলে,
মাল্যখানি গাঁথা  সাঁজের কোন্ ফুলে
লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।
একটুখানি তুমি  দাঁড়িয়ে যদি যেতে!
নতুন ফুলে দেখো,  কানন ওঠে মেতে—
দিতেম ত্বরা করে  নবীন মালা গেঁথে
কনকচাঁপা-বনছায়ে।
মাঠের পথে যেতে  তোমার মালাখানি
প'ল কি বেণী হতে খসে।
আজকে ভাবি তাই বসে।

নূপুর ছিল ঘরে
গিয়েছ পায়ে প'রে—
নিয়েছ হেথা হতে তাই,
অঙ্গে আর কিছু নাই।
আকুল কলতানে  শতেক রসনায়
চরণ ঘেরি তব  কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার  বিরহবেদনায়
মুখর করে তব পথ।
জানি না কী এত যে  তোমার ছিল ত্বরা,
কিছুতে হল না যে  মাথার ভূষা পরা—

দিতেম খুঁজে এনে   সিঁথিটি মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ।
হেলায়-বাঁধা সেই   নূপুরদুটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে কথা ভাবি তরুমূলে।

অনেক গীতগান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁঝে,
অনেক অবসরে কাজে।
তাহারি শেষ গান   আধেক লয়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে   গেছ সুদূর পানে—
আধেক জানা সুরে   আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুন্‌গুন্‌ স্বরে।
কেন না গেলে শুনি   একটি গান আরো—
সে গান শুধু তব,   সে নহে আর কারো;
তুমিও গেলে চলে   সময় হল তারো,
ফুটল তব পূজা-তরে।
মাঠের কোন্‌খানে   হারালো শেষ সুর
যে গান নিয়ে গেলে শেষে,
ভাবি যে তাই অনিমেষে।

হাজারিবাগ
১০ চৈত্র ১৩০৯

৪১

পথের পথিক করেছ আমায়,

সেই ভালো ওগো সেই ভালো।

আলেয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে,

সেই আলো মোর সেই আলো!

ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়াতরী,

তাও কি ডুবালে ছল করি!

সাঁতারিয়া পার হব বহি ভার,

সেই ভালো মোর সেই ভালো।

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়

সেই ভালো ওগো সেই ভালো।

সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে,

সেই আলো মোর সেই আলো!

সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি,

কী ভয় লাগালে গেল ছাড়ি!

একাকীর পথে চলিব জগতে,

সেই ভালো মোর সেই ভালো।

কোনো মান তুমি রাখ নি আমায়,

সেই ভালো ওগো সেই ভালো।

হৃদয়ের তলে যে আগুন জলে
সেই আলো মোর সেই আলো।
পাথেয় যে-ক'টি ছিল কড়ি
পথে খসি কবে গেছে পড়ি—
শুধু নিজবল আছে সম্বল
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

[ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ ]

৪২

আলো নাই, দিন শেষ হল ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ঘণ্টা বাজিল দূরে,
ওপারের রাজপুরে,
এখনো যে পথে চলেছিস্ তুই
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

দেখ্ সবে ঘরে ফিরে এল ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
পূজা সারি দেবালয়ে
প্রসাদী কুসুম লয়ে
এখন ঘুমের কর্ আয়োজন

হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

রজনী আঁধার হয়ে আসে ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ওই-যে গ্রামের 'পরে
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীপহীন পথে কী করিবি একা
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস্ ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ?
নামাবি এমন ঠাঁই
পাড়ায় কোথা কি নাই?
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ!

পথের চিহ্ন দেখা নাহি যায়
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
কোন্ প্রান্তরশেষে
কোন্ বহুদূর দেশে

কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ !

[ অগ্রহায়ণ ১৩০১ ]

৪৩

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
তুমি এসো এসো নারী,
আনো তব হেমঝারি।
ধুয়ে-মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন—
সুন্দর করো, সার্থক করো
পুঞ্জিত আয়োজন।
এসো সুন্দরী নারী,
শিরে লয়ে হেমঝারি।

হাটে আর নাই কেহ।
শেষ করে খেলা ছেড়ে এনু মেলা,
গ্রামে গড়িলাম গেহ।

তুমি এসো এসো নারী,
আনো গো তীর্থবারি।
স্নিগ্ধহসিত বদনইন্দু,
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুরবিন্দু,
মঙ্গল করো, সার্থক করো
শূন্য এ মোর গেহ।
এসো কল্যাণী নারী,
বহিয়া তীর্থবারি।

বেলা কত যায় বেড়ে।
কেহ নাহি চাহে খর-রবিদাহে
পরবাসী পথিকেরে।
তুমি এসো এসো নারী,
আনো তব সুধাবারি।
বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক করো
পরবাসী পথিকেরে।
আনন্দময়ী নারী,
আনো তব সুধাবারি।

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা।
এবারের মতো দিন হল গত,
এলো বিদায়ের বেলা!

তুমি এসো এসো নারী,
আনো গো অশ্রুবারি।
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
পথে ক'রে দিক্ করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হোক্ বিদায়ের বেলা।
অয়ি বিষাদিনী নারী,
আনো গো অশ্রুবারি।

আঁধার নিশীথরাতি।
গৃহ নির্জন, শূন্য শয়ন,
জ্বলিছে পূজার বাতি।
তুমি এসো এসো নারী,
আনো তর্পণবারি।
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্রবসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।
এসো তাপসিনী নারী,
আনো তর্পণবারি।

[ পৌষ ১৩০২ ]

আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা !
কোথা হতে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে,
অঘ্রানেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা,
আমরা কিছুই জানি নেকো সেই সুদূরের কথা।
আমরা জানি গ্রাম ক'খানি, চিনি দশটি গিরি—
মা ধরণী রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি।

সে ছিল ওই বনের ধারে ভুট্টাখেতের পাশে
যেখানে ওই ছায়ার তলে জলটি ঝরে আসে।
ঝর্না হতে আনতে বারি জুটত হোথা অনেক নারী,
উঠত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের দ্বারে,
সকাল-সাঁঝে আনাগোনা তারি পথের ধারে।
মিশত কুলু-কুলুধ্বনি তারি দিনের কাজে,
ওই রাগিণী পথ হারাতো তারি ঘুমের মাঝে।

সন্ধ্যাবেলায় সন্ন্যাসী এক, বিপুল জটা শিরে,
মেঘে-ঢাকা শিখর হতে নেমে এলেন ধীরে।
বিস্ময়েতে আমরা সবে শুধাই, 'তুমি কে গো হবে !'
বসল যোগী নিরুত্তরে নির্ঝরিণীর কূলে
নীরবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে।

অজানা কোন্ অমঙ্গলে বক্ষ কাঁপে ডরে—
রাত্রি হল, ফিরে এলেম যে যার আপন ঘরে।

পরদিনে প্রভাত হল দেবদারুর বনে,
ঝর্নাতলায় আনতে বারি জুটল নারীগণে।
দুয়ার খোলা দেখে আসি, নাই সে খুশি, নাই সে হাসি—
জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে,
নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘরের কোণে জ্বলে।
কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোহাতেই,
শূন্য ঘরের দ্বারের কাছে সন্ন্যাসীও নেই।

চৈত্রমাসে রৌদ্র বাড়ে, বরফ গ'লে পড়ে—
ঝর্নাতলায় বসে মোরা কাঁদি তাহার তরে।
আজিকে এই তৃষার দিনে কোথায় ফিরে নিঝর বিনে,
শুষ্ককলস ভরে নিতে কোথায় পাবে ধারা!
কে জানে সে নিরুদ্দেশে কোথায় হল হারা!
'কোথাও কিছু আছে কি গো' শুধাই যারে তারে—
'আমাদের এই আকাশ-ঢাকা দশ পাহাড়ের পারে?'

গ্রীষ্মরাতে বাতায়নে বাতাস হু হু করে,
বসে আছি প্রদীপ-নেবা তাহার শূন্য ঘরে।
শুনি বসে দ্বারের কাছে ঝর্না যেন তারেই যাচে—
বলে, 'ওগো, আজকে তোমার নাই কি কোনো তৃষা?

জলে তোমার নাই প্রয়োজন, এমন গ্রীষ্মনিশা?'
আমিও কেঁদে কেঁদে বলি, 'হে অজ্ঞাতচারী,
তৃষ্ণা যদি হারাও তবু ভুলো না এই বারি।'

হেনকালে হঠাৎ যেন লাগল চোখে ধাঁধা—
চারি দিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাধা।
ওই যে আসে কারে দেখি— আমাদের যে ছিল সে কি!
'ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে?
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে?
নাইকো পাহাড়, কোনোখানে ঝর্না নাহি ঝরে,
তৃষ্ণা পেলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে?'

সে কহিল, 'যে ঝর্না বয় সেথা মোদের দ্বারে
নদী হয়ে সেই চলেছে হেথা উদার ধারে।
সেই আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে অসীম-পানে গেছে বেড়ে,
সেই ধরারেই নাইকো হেথা পাষাণবাধা বেঁধে।'
'সবই আছে, আমরা তো নেই' কইনু তারে কেঁদে।
সে কহিল করুণ হেসে, 'আছ হৃদয়মূলে।'
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝর্নাকূলে।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
১০ মাঘ ১৩০৯

অত চুপিচুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরই ধরন!
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো, অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

হায় এমনি করে কি ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ!
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে?

শেষে    পসারিয়া তব হিম-কোল
    মোরে   স্বপনে করিবে হরণ ?
আমি    বুঝি না যে কেন আস-যাও
    ওগো   মরণ, হে মোর মরণ।

কহো    মিলনের এ কি রীতি এই,
    ওগো   মরণ, হে মোর মরণ।
তার    সমারোহভার কিছু নেই,
    নেই   কোনো মঙ্গলাচরণ ?
তব    পিঙ্গলছবি মহাজট
    সে কি   চূড়া করি বাঁধা হবে না ?
তব    বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
    সে কি   আগে পিছে কেহ ববে না ?
তব    মশাল-আলোকে নদীতট
    আঁখি   মেলিবে না রাঙাবরন ?
ত্রাসে    কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
    ওগো   মরণ, হে মোর মরণ ?

যবে    বিবাহে চলিলা বিলোচন
    ওগো,   মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর   কতমতো ছিল আয়োজন,
    ছিল   কতশত উপকরণ !

তাঁর   লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর   বৃষ রহি রহি গরজে;
তাঁর   বেষ্টন করি জটাজাল
যত   ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর   ববম্‌ববম্‌ বাজে গাল,
দোলে   গলায় কপালাভরণ,
তাঁর   বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো   মরণ, হে মোর মরণ।

শুনি   শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো   মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে   গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর   কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর   বাম আঁখি ফুরে থরথর,
তাঁর   হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর   পুলকিত তনু জরজর,
তাঁর   মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর   মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
ক্ষ্যাপা   বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর   পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো   মরণ, হে মোর মরণ।

তুমি    চুরি করি কেন এস চোর,
ওগো    মরণ, হে মোর মরণ?
শুধু    নীরবে কখন্ নিশি-ভোর,
শুধু    অশ্রুনির্ঝর-ঝরন!
তুমি    উৎসব করো সারারাত
তব    বিজয়শঙ্খ বাজায়ে।
মোরে    কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব    রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি    কারে করিয়ো না দৃকপাত,
আমি নিজে লব তব শরণ
যদি    গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো    মরণ, হে মোর মরণ।

যদি    কাজে থাকি আমি গৃহ-মাঝ
ওগো    মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি    ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ,
কোরো    সব লাজ অপহরণ।
যদি    স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি    শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি    হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি    আধজাগরূক নয়নে,
তবে    শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি    প্রলয়শ্বাস ভরণ—

আমি   ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো   মরণ, হে মোর মরণ।

আমি   যাব যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা   অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারে অনুসরণ।
যদি   দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর   ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি   বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার   উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি   ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি   করিব নীরবে তরণ
সেই   মহা-বরষার রাঙা জল
ওগো   মরণ, হে মোর মরণ।

[ ভাদ্র ১৩০৯ ]

৪৬

সে তো সেদিনের কথা বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মতো এই ভবে।
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে সাথে।
আজ সেথা কী করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হতে টানি লয় যত মোর গীতি।
এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ ভুবননাথ! সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ। পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে-বাঁধা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি তাও তব পূজাশেষে
লবে সবে তোমা-সাথে মোরে ভালোবেসে,
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে।
যে প্রবাসে রাখ সেথা প্রেমে রাখো বেঁধে।

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে; প্রেম-আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে—

বাহিরে আসিবে ছুটি— অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল-মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

[ বৈশাখ ১৩০৯ ]

—

১

‘হে পথিক, কোন্‌খানে
চলেছ কাহার পানে ?’
গিয়েছে রজনী, উঠে দিনমণি,
চলেছি সাগর-স্নানে।
উষার আভাসে তুষার-বাতাসে
পাখির উদার গানে
শয়ন তেয়াগি উঠিয়াছি জাগি,
চলেছি সাগর-স্নানে।

‘শুধাই তোমার কাছে,
সে সাগর কোথা আছে ?’
যেথা এই নদী বহি নিরবধি
নীল জলে মিশিয়াছে।

সেথা হতে রবি উঠে নবছবি,
লুকায় তাহারি পাছে—
তপ্ত প্রাণের তীর্থস্নানের
সাগর সেথায় আছে।

'পথিক তোমার দলে
যাত্রী কজন চলে?'
গনি তাহা ভাই শেষ নাহি পাই,
চলেছে জলে স্থলে।
তাহাদের বাতি জ্বলে সারা রাতি
তিমির-আকাশ-তলে।
তাহাদের গান সারা দিনমান
ধ্বনিছে জলে স্থলে।

'সে সাগর, কহো, তবে
আর কত দূরে হবে?'
আর কত দূরে আর কত দূরে
সেই তো শুধাই সবে।
ধ্বনি তার আসে দখিন বাতাসে
ঘনভৈরব রবে।
কভু ভাবি কাছে, কভু দূরে আছে—
আর কত দূরে হবে!

‘পথিক, গগনে চাহো,
বাড়িছে দিনের দাহ।’
বাড়ে যদি দুখ হব না বিমুখ
নিবাব না উৎসাহ।
ওরে, ওরে ভীত, তৃষিত, তাপিত,
জয়সংগীত গাহো।
মাথার উপরে খর রবিকরে
বাড়ুক দিনের দাহ।

‘কী করিবে চ’লে চ’লে
পথেই সন্ধ্যা হলে?’
প্রভাতের আশে স্নিগ্ধ বাতাসে
ঘুমাব পথের কোলে।
উদিবে অরুণ নবীন করুণ
বিহঙ্গকলরোলে।
সাগরের স্নান হবে সমাধান
নূতন প্রভাত হলে।

[ বৈশাখ ১৩০৮ ]

২

কী কথা বলিব বলে
বাহিরে এলেম চলে,
দাঁড়ালেম দুয়ারে তোমার—
ঊর্ধ্বমুখে উচ্চরবে
বলিতে গেলেম যবে
কথা নাহি আর।
যে কথা বলিতে চাহে প্রাণ
সে শুধু হইয়া উঠে গান।
নিজে না বুঝিতে পারি,
তোমারে বুঝাতে নারি—
চেয়ে থাকি উৎসুকনয়ান।

তবে কিছু শুধায়ো না—
শুনে যাও আনমনা
যাহা বোঝ, যাহা না'ই বোঝ।
সন্ধ্যার আঁধার-'পরে
মুখে আর কণ্ঠস্বরে
বাকিটুকু খোঁজো।
কথায় কিছু না যায় বলা,
গান সেও উন্মত্ত উতলা!
তুমি যদি মোর সুরে
নিজ কথা দাও পুরে
গীতি মোর হবে না বিফলা।

[ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ ? ]

৩

কত দিবা কত বিভাবরী
কত নদীনদে লক্ষ স্রোতের
মাঝখানে এক পথ ধরি,
কত ঘাটে ঘাটে লাগায়ে,
কত সারিগান জাগায়ে,
কত অঘ্রানে নব নব ধানে
কতবার কত বোঝা ভরি,
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে কত স্বর্ণভার
কোন্ গ্রামে আজ সাধিতে কী কাজ
বাঁধিয়া ধরিলে তব তরী ?

হেথা বিকিকিনি কার হাটে ?
কেন এত ত্বরা লইয়া পসরা
ছুটে চলে এরা কোন্ বাটে ?
শুন গো থাকিয়া থাকিয়া
বোঝা লয়ে যায় হাঁকিয়া,
সে করুণ স্বরে মন কী যে করে—
কী ভেবে আমার দিন কাটে !
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
হেথা কারা রয় লহো পরিচয়,
কারা আসে যায় এই ঘাটে।

যেথা হতে যাই, যাই কেঁদে।
এমনটি আর পাব কি আবার
সয়ে না যে মন সেই খেদে।
সে-সব কাঁদন-ভুলানে,
কী দোলায় প্রাণ দুলালে!
হোথা যারা তীরে আনমনে ফিরে
আমি তাহাদের মরি সেধে।
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
এই হাটে নামি দেখে লব আমি—
এক বেলা তরী রাখো বেঁধে।

গান ধর তুমি কোন্ সুরে!
মনে পড়ে যায়, দূর হতে এনু
যেতে হবে পুন কোন্ দূরে।
শুনে মনে পড়ে, দুজনে
খেলেছি সজনে বিজনে,
সে যে কত দেশ নাহি তার শেষ—
সে যে কত কাল এনু ঘুরে!
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
বাজিয়াছে শাঁখ, পড়িয়াছে ডাক,
সে কোন্ অচেনা রাজপুরে!

## ৪

বিরহবৎসর-পরে, মিলনের বীণা,
তেমন উন্মাদমন্দ্রে কেন বাজিলি না ?
কেন তোর সপ্ত স্বর সপ্তস্বর্গ-পানে
ছুটিয়া গেল না ঊর্ধ্বে উদ্দাম পরানে
বসন্তে মানসযাত্রী বলাকার মতো ?
কেন তোর সর্ব তন্ত্র সবলে প্রহত
মিলিতঝংকারভরে কাঁপিয়া কাঁদিয়া
আনন্দের আর্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া
উঠিল না বাজি ? হতাশ্বাস মৃদুস্বরে
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া লাজে শঙ্কাভরে
কেন মৌন হল ? তবে কি আমারি প্রিয়া
সে পরশনিপুণতা গিয়াছে ভুলিয়া !
তবে কি আমারি বীণা ধূলিচ্ছিন্ন-তার
সেদিনের মতো ক'রে বাজে নাকো আর !

শিলাইদহ
২১ আষাঢ় ১৩০৩

## ৫

অচিরবসন্ত হায় এল, গেল চলে—
এবার কিছু কি, কবি, করেছ সঞ্চয় ?
ভরেছ কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে
চঞ্চলপবনক্লিষ্ট শ্যাম কিশলয়,

ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ ? তপ্ত রৌদ্র হতে
নিয়েছ কি গলাইয়া যৌবনের সুরা,
ঢেলেছ কি উচ্ছলিত তব ছন্দস্রোতে,
রেখেছ কি করি তারে অনন্তমধুরা ?
এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমানিশীথে
নবমল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে
তোমার আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে,
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সংগীতে !
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে !

[ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ ]

৬

ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী,
লুব্ধ বাহু বাড়াইয়া উচ্ছ্বসি উল্লসি
আমারে কি পেতে চাস চির-আলিঙ্গনে ?
শুধু এক মুহূর্তের উন্মত্ত মিলনে
তোর বক্ষ-মাঝে চাস করিতে বিলয়
আমার বক্ষের যত সুখ দুঃখ ভয় ?
আমিও তো কতদিন ভাবিয়াছি মনে
বসি তোর তটোপান্তে প্রশান্ত নির্জনে—

বাহিরে চঞ্চলা তুই প্রমত্তমুখরা,
শাণিত অসির মতো ভীষণপ্রখরা,
অন্তরে নিভৃত স্নিগ্ধ শান্ত সুগম্ভীর,
দীপহীন রুদ্ধদ্বার অর্ধরজনীর
বাসরঘরের মতো নিষুপ্ত নির্জন—
সেথা কার তরে পাতা সুচির শয়ন!

[ চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৮-০৯ ]

৭

দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে, করুণানিলয়—
হে প্রভু, প্রত্যহ মোরে দিয়েছ প্রশ্রয়।
ফিরেছি আপন-মনে আলসে লালসে
বিলাসে আবেশে ভেসে প্রবৃত্তির বশে
নানা পথে, নানা ব্যর্থ কাজে— তুমি তবু
তখনো যে সাথে সাথে ছিলে মোর প্রভু
আজ তাহা জানি। যে অলস চিন্তালতা
প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘন জটিলতা
হৃদয়ে বেষ্টিয়া ছিল, তারি শাখাজালে
তোমার চিন্তার ফুল আপনি ফুটালে
নিগূঢ় শিকড়ে তার বিন্দু বিন্দু সুধা
গোপনে সিঞ্চন করি। দিয়ে তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
দিয়ে দণ্ড-পুরস্কার সুখ-দুঃখ ভয়,
নিয়ত টানিয়া কাছে দিয়েছ প্রশ্রয়।

২৩ ফাল্গুন ১৩০৭

৮

রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জাগি—
বাহিরে দাঁড়ানু এসে ক্ষণেকের লাগি।
শান্ত মৌন নগরীর সুপ্তহর্ম্যশিরে
হেরিনু জ্বলিছে তারা নিস্তব্ধ তিমিরে।
ভূত ভাবী বর্তমান একটি পলকে
মিলিল বিষাদস্নিগ্ধ আনন্দপুলকে
আমার অন্তরতলে ; অনির্বচনীয়
সে মুহূর্তে জীবনের যত-কিছু প্রিয়,
দুর্লভ বেদনা যত, যত গত সুখ,
অনুদ্গত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌনমূক
আমার হৃদয়পাত্রে হয়ে রাশি রাশি
কী অনলে উজ্জ্বলিল ! সৌরভে নিশ্বাসি
অপরূপ ধূপধূম উঠিল সুধীরে
তোমার নক্ষত্রদীপ্ত নিঃশব্দ মন্দিরে।

৯

কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে
গাহিতে তোমার গান কহিল সকলে
সহসা রুধিয়া গেল হৃদয়ের দ্বার—
যেথায় আসন তব, গোপন আগার।

স্থানভেদে তব গান মূর্তি নব নব—
সখা-সনে হাস্যোচ্ছ্বাস সেও গান তব ;
প্রিয়া-সনে প্রিয়ালাপ, শিশু-সনে খেলা,
জগতে যেথায় যত আনন্দের মেলা,
সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।
আকাশে তারকা ফুটে, ফুলবনে ফুল,
খনিতে মানিক থাকে, হয় নাকো ভুল—
তেমনি আপনি তুমি যেখানে যে গান
রেখেছ, কবিও যেন রাখে তার মান।

১০

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ;
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়,
'তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর এ কী চপলতা!
কেন হাস্য-পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে!'
দিয়েছি উত্তর তাঁরে, 'ওগো পক্বকেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ।
যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
ধ্বনিত মানবপ্রাণ, আমার বীণায়

দিয়েছেন তারি সুর— সে তাঁহারি দান,
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।
তব আজ্ঞা রক্ষা করি নাই সে ক্ষমতা,
সাধ্য নাই তাঁর আজ্ঞা করিতে অন্যথা।'

১১

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে,
কে তোমারে আন্দোলিছে বিরাট মন্থনে
অনন্ত বরষ ধরি। দেবদৈত্যদলে
কী রত্ন সন্ধান লাগি তোমার অতলে
অশান্ত আবর্ত নিত্য রেখেছে জাগায়ে
পাপে-পুণ্যে সুখে-দুঃখে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়
ফেনিল কল্লোলভঙ্গে! ওগো, দাও দাও
কী আছে তোমার গর্ভে— এ ক্ষোভ থামাও।
তোমার অন্তরলক্ষ্মী যে শুভ প্রভাতে
উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি হাতে
বিস্মিত ভুবন-মাঝে, লয়ে বরমালা
ত্রিলোকনাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা—
সেদিন হইবে ক্ষান্ত এ মহামন্থন,
থেমে যাবে সমুদ্রের রুদ্র এ ক্রন্দন।

আলমোড়া
২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

১২

নব বৎসরে করিলাম পণ,
লব স্বদেশের দীক্ষা—
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন না হইব হীন—
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা।

না থাকে প্রাসাদ আছে তো কুটির
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে
তোমারে দেখেছি তত ছোটো করে—
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণকুটির
কল্যাণে সুপবিত্র।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা—
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পরেছি পরের সজ্জা।
কিছু নাহি গনি কিছু নাহি কহি
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি—
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।

সে-সকল লাজ তেয়াগিব আজ,
লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম— তোমার কর্ম—
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা।

বৈশাখ ১৩০৯ ]

১৩

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।

কাঞ্চনথালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিকো জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন—
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন—
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধুলা লুটে।
সুরদুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে।

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন—
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

[ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ ]

—

উৎসর্গের বহু কবিতার ( সংখ্যা ৩১, ৩৪, ৩৯-৪৪ ) যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্যের ধারণা হইবে ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ তারিখে কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর অকাল তিরোধানের কথা মনে রাখিলে। ফলতঃ একমাত্র স্মরণ কাব্যেই প্রিয়জনের উদ্দেশে কবির স্মৃতিতর্পণ নিঃশেষ হয় নাই— উৎসর্গেও তাহার অনুবৃত্তি দেখা যায়।

উৎসর্গ ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। সকল কবিতাই মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত; অনেকগুলি উহার বিভিন্ন বিভাগের প্রবেশকরূপে মুদ্রিত।

উৎসর্গ কাব্যের ১৩৫১ সংস্করণে— কত কী যে আসে কত কী যে যায়, কথা কও কথা কও, নিবেদিল রাজভৃত্য এই তিনটি কবিতা বর্জিত হয়। এগুলি 'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থে পূর্বাবধি প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। ১৩১০ সালে বা তাহার পূর্বে রচিত কতকগুলি কবিতা এ পর্যন্ত কোনো কাব্যে সংকলিত হয় নাই; পূর্বোল্লিখিত কাব্যগ্রন্থ ও বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কৃত সেগুলির এক সংকলন গ্রন্থশেষে সংযোজিত। বর্তমান সংস্করণে ( ১৩৮৭ ), সংযোজিত কবিতানিচয়ের পুনর্বিন্যাস করা হইল রূপকল্প বিষয়বস্তু এবং জ্ঞাত বা অনুমিত কালক্রম অনুসারে। যেমন সংখ্যা ৪। ৫ বিষয়ে ও রচনাকালে পরস্পর-সম্পর্কিত বলা চলে, তেমনি সংখ্যা ৭-১০ একই ভাবশৃঙ্খলায় বিন্যস্ত এবং প্রথমটি ছাড়া সব-কয়টি মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থের ( ১৩১০ ) 'নৈবেদ্য' হইতে গৃহীত। দশম খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে উৎসর্গ সম্পর্কে নানা তথ্যের সমাবেশ— তাহা দ্রষ্টব্য।

৪০-সংখ্যক রচনাটি আদ্যন্ত মাত্রাবৃত্তে রচিত। সূচনায় এবং অন্যত্র স্বরবৃত্তের আভাস থাকাতেই এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪৪-সংখ্যক কবিতায় শেষ স্তবকের প্রথম ছত্র ইতিপূর্বে পাণ্ডুলিপি অনুসারে সংশোধিত। বর্তমান সংস্করণে উক্ত কবিতায় আরো দুটি সংশোধন পাণ্ডুলিপি, বঙ্গদর্শন ও মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ ( ১৩১০ ) অনুযায়ী করা হইল—

স্তবক ৫ ছত্র ৩ 'ফেরে' স্থলে 'ফিরে'

স্তবক ৮ ছত্র ৩ 'সে আকাশ' স্থলে 'সেই আকাশ'

শেষ স্তবকের তৃতীয় ছত্রে 'সেই পাহাড়'-এর ভিন্ন পাঠ 'এই পাহাড়' বঙ্গদর্শনে পাওয়া যায়। ঐ স্তবকের চতুর্থ ছত্রে 'পাষাণবাঁধা'র ভিন্ন পাঠ 'পাষাণবাধা' বঙ্গদর্শনে পাওয়া যায়।

কেবল সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল জানা থাকিলে, গ্রন্থমধ্যে কবিতার শেষে তাহার বিজ্ঞাপন বন্ধনীর অন্তর্গত। সাময়িক পত্রে রচনা প্রকাশের সূচী যত দূর জানা যায়, নিম্নে দেওয়া গেল। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থ -ধৃত ক্রমিক সংখ্যা ও সাময়িক পত্র -ধৃত শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে।

## প্রকাশসূচী

| সংখ্যা | রচনা | সাময়িক পত্র। সংখ্যা। পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | ভোরের পাখি ডাকে কোথায় | |
| | ভোরের পাখি | : বঙ্গদর্শন। বৈশাখ ১৩১০। ১ |
| ৮ | আমি চঞ্চল হে | |
| | সুদূর | : প্রবাসী। মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৯। ৩৩৩ |

৯ কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ

অস্ফুট : সমালোচনী। আশ্বিন ১৩০৯। ৩৫৯

১১ না জানি কারে দেখিয়াছি

চিঠি : বঙ্গদর্শন। ভাদ্র ১৩১০। ২১০

১৪ সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি

প্রবাসী : প্রবাসী। বৈশাখ ১৩০৮। ২২

১৫ আকাশসিন্ধু-মাঝে এক ঠাঁই : সাময়িক পত্রে প্রকাশ জানা নাই। জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রে ইহার আভাস। দ্রষ্টব্য : চিঠিপত্র ৬। পত্র ২১ তারিখ : ৬ আষাঢ় ১৩০৯

১৬ হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি

স্বদেশ : বঙ্গদর্শন। পৌষ ১৩০৯। ৪৫৭

১৯ হে রাজন্‌, তুমি আমারে

বাদক : সমালোচনী। কার্তিক ১৩০৯। ৪০৮

২১ বাহির হইতে দেখো না এমন করে

কবিচরিত : বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮। ১০৫

২২ আছি আমি বিন্দুরূপে

কবির বিজ্ঞান : বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮। ১০৬

২৩ শূন্য ছিল মন

শুক্ল-সন্ধ্যা : বঙ্গদর্শন। আশ্বিন ১৩০৯। ২৯০

২৪ হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত

হিমালয় : বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩১০। ১৮৭

২৫ ক্লান্ত করিয়াছ তুমি আপনার

ক্লান্তি : বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩১০। ১৮৮

২৬ আজি হেরিতেছি আমি হে হিমাদ্রি

শিলালিপি : বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩১০। ১৮৮

২৭ তুমি আছ হিমাচল, ভারতের

তপোমূর্তি : বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩১০। ১৮৯

২৮ হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে

হরগৌরী : বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩১০। ১৮৯

২৯ ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস

সঞ্চিত বাণী : বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩১০। ১৯০

৩০ ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি

জগদীশচন্দ্র বসু : বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩০৮। ১২৩

৩১ আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে

মুক্তপাখীর প্রতি : বঙ্গদর্শন। অগ্রহায়ণ ১৩০৯। ৪০১

৩২ যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী

গৃহলক্ষ্মী : উৎসাহ। ? ১৩০৭ পৌষ ?। ৮১

৩৩ দেখো চেয়ে গিরির শিরে

মেঘোদয়ে : বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩১০। ১৩৬

৩৪ আমি যারে ভালোবাসি

গ্রাম : বঙ্গদর্শন। আষাঢ় ১৩১০। ১০৭

৩৫ ওরে আমার কর্মহারা

চৈত্রের গান : বঙ্গদর্শন। বৈশাখ ১৩১০। ১৪

৩৬ আমার খোলা জানালাতে

সন্ধ্যা : বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ ১৩১০। ৬২

৩৮ চিরকাল একি লীলা গো

বিশ্বদোল : বঙ্গদর্শন। পৌষ ১৩০৯। ৪৭৭

৪০ মন্ত্রে সে যে পূত

যাত্রিণী : বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ ১৩১০। ৭৯

৪১ পথের পথিক করেছ আমায়

দুর্ভাগা : বঙ্গদর্শন। অগ্রহায়ণ ১৩০৯ ৪৩৩

৪২ আলো নাই, দিন শেষ হল ওরে

পথিক : বঙ্গদর্শন। অগ্রহায়ণ ১৩০৯। ৪৪৪

৪৩ সাজ হয়েছে রণ

নারী : বঙ্গদর্শন। পৌষ ১৩০৯ ৪৬৮

৪৪ আমাদের এই পল্লীখানি

ঝরণাতলা : বঙ্গদর্শন। চৈত্র ১৩০৯। ৬৩৫

৪৫ অত চুপি চুপি কেন কথা কও

মরণ : বঙ্গদর্শন। ভাদ্র ১৩০৯ ২৫৫

৪৬ সে তো সেদিনের কথা

প্রবাসের প্রেম : ১ ও ২ : প্রবাসী। বৈশাখ ১৩০৯ ৩৩ ও ৩৪

॥ সংযোজন ॥

১ হে পথিক, কোন্‌খানে

সাগর-সঙ্গম : ভারতী। বৈশাখ ১৩০৮। ২

২ কী কথা বলিব বলে

গান : সমালোচনী। সংখ্যা.২। বর্ষ ২ (জ্যৈষ্ঠ ১৩১০?)। ৬৫

৪ বিরহবৎসর-পরে

বিরহান্তে : ভারতী। ভাদ্র ১৩০৩। ৩১৮

দ্র. প্রভাতরবি। দেশ। সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫। ১৬০-৬১

পত্র ৩৩-৩৪

৫ অচিরবসন্ত হায় এল, গেল চলে

প্রত্যুপহার : প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। ১৮৫। দ্র. চিঠিপত্র ৮ পত্র ১০০

৬ ওরে পদ্মা, ওরে মোর

অন্তিম প্রেম : সমালোচনী। চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৮-১৩০৯। ১৬৪

৭ দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে

প্রশ্রয় : ভারতী। বৈশাখ ১৩১৫। ৪৮

১১ হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে

সাগরমন্থন : বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩১০। ১৭৭

১২ নববৎসরে করিলাম পণ

নববর্ষের দীক্ষা : মুকুল। বৈশাখ ১৩০৯। ৪

১৩ হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে

নববর্ষের গান : বঙ্গদর্শন। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯। ৬১

মাসিক পত্রে প্রচারের কথা জানা থাকিলে, কবিতার রচনাকাল-নির্ণয়ে সুবিধা হয়। ১৩০৯ বঙ্গদর্শনের নিয়মাবলীর মধ্যে ছিল: 'মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বঙ্গদর্শন না পাইলে' ইত্যাদি। অর্থাৎ, বঙ্গদর্শন পত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইত।

উৎসর্গের কতকগুলি রচনা মজুমদার-পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়। বর্তমান গ্রন্থে সেই কবিতাগুলির সংখ্যা হইল যথাক্রমে— ১, ১১, ২৪-২৯, ৩৩-৩৬, ৪০, ৪৪ ও সংযোজন ১১।

সম্পাদনা ও গ্রন্থপরিচয়-যোজনা : কানাই সামন্ত

## প্রথম ছত্রের সূচী

—